নদীর ধারের বাড়ী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥নদীর ধারের বাড়ী॥

শ্যামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর লেনে। দু নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন। সেকেলে পুরনো বাড়ী, দোতলার ছটি ঘরে পরিবারের বাস। কলতলায় দুটিবেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওদের মধ্যে একটু দেখতে ভাল, বয়েস তিরিশের সামান্য ওপরে, দু-এক বছর ওপর। চার সন্তানের মা, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাতা ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

শ্যামলী বললে—ফিরবে কখন?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য্য। যদুনাথ একটা সওদাগরি আফিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরী করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া-দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলে-মেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না; দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

BANGLADARSHAN.COM

যদুনাথ বললে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ী দ্যাখো, বুঝলে?

—সে তো বুঝলাম, বাড়ী মিলচে কই? খুঁজতে কি কম করচি?

—এ বাড়ীতে আর টেকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল?

—কবে না হয়? বিশ্বেস-গিন্নীর সঙ্গে মতির মা-র ঝগড়া কালও খুব। অভয়ার সঙ্গে রামবাবুর বৌয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে?

—তা আবার কি নিয়ে? ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে। রোজ রোজ এ ইতরুমি আর ভাল লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেচে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলেমেয়েরা খেয়ে দেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল; ছেলে দুটি বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে। মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কায়ক্লেশে বসে দুটি আহার করতে পারে। আজ ন'টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাসাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার

হচ্ছে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন'বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জনবাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালবাসে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—কাকীমা কি রাঁধলে?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেন কি কাকাবাবু?

—নাঃ। দু টাকা চিংড়ি মাছের সের। মাছ আর কি কেনবার জো আছে? উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর খুব কম, কাকিমা। আপনারা রেশন আনেন নি?

—বুধবার আসবে রেশন। এখনো আনা হয় নি। তোমার কাকা যেতে সময় পান নি। বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নীরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়—এইজন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোবার কি কষ্ট বিকেলে। এই গুমট গরমে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘণ্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনেই ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্দুমার ঝগড়া।

BANGLADARSHAN.COM

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বললে—ও দিদি, কি হচ্চে?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেছে। আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনবো!

—রেশন এসেছে?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমার আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে?

—আসুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরানীর বৌ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুন খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস গিন্নী দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দ্দার। তিনি

সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দ্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে কি হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বললে চিনি দিতে হবে, 'না' বললে আর রক্ষে আছে? কোন্ কালের এক বাটি নুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে, বরিশালের টানে–আমরা কি কোনদিন কিছু কাউকে দিই নাই কি! সময়ে অসময়ে নুন রে–তেল রে–তা নিয়ে মনে থাকবে ক্যানে? ঘোর কলি যে! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি–আচ্ছা আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না! তখন যেন–ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আই-ঢাই করে গরমে। আজ ন বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভাল বললেও এ বাড়ীতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল–দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললেন, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়–সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যদি কোথায়। শশীবাবুর বৌ চীৎকার জুড়ে দিল–আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয়; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে–যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরীব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহলে দোতলা বাড়ী আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়া বাস করলেই তো হয়–ইত্যাদি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বললে–দিদি, কি পাগলের মত বকচেন? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন? কেন আমি তা ফেলতে দেবো?

–ফেলতে দেবে না তোমার কথায়? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু! তুমি পাগল না আমি পাগল? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা–তুমি বলতে আসবার কে?

–তা বলে পরের সুবিধে অসুবিধে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ? তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্য্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এর পর বাধলো আসল ঝগড়া যার নাম–। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশীবাবুর বৌও না–উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র। তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দুপক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও। প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার জো নেই। ওই আর এক গোলমাল। একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে। কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে! ভোরে অন্ধকার থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কল পায়খানা

ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আপিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু'ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।...

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্ততঃ মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে?...

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আ-আ-ম—

বৃষ্টি এখনও নামে নি এবার। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বললে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা?

শ্যামলী বললে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না?

—কিছু নেই।

BANGLADARSHAN.COM

মেয়েটা চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোন আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে বিরক্ত হয়েচে? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে এক নম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আপিসের রেশন বেচে। সে কী ঝাঁজওয়ালা তেল। মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভাল তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচসিকে সেরের কলের তেল দিয়ে। উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয়। শ্যামলীদের ফি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয় যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে দেশ পলা। একসঙ্গে নেবে না। একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে।...দেবো না তেল, রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয়।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে এতটুকু চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে সে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভঅই একটু তেল।

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্চে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

–দেখি তোর তেলের বোতল? দে ভাই আমায় পাঁচ পলা–

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁদুনি-মিনতি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকত তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোকে তাতে খুশী হয়, হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁটমঙ্গলের সৃষ্টি হোল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে।...তেল থাকতেও দিতে চাচ্চিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারি নে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যান নি আমাদের এখান থেকে? দিই নি আমরা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ীটা– সেকথা শ্যামলী ভাল রকমেই জানে। অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হোল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

BANGLADARSHAN.COM

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বললেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুরে বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড়লোকের জমিদারি কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারিবাড়ীর সংলগ্ন দোতলা বাড়ী তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারিবাড়ী, তাতে আম কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ীর সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্চে, তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটালা করে দিয়েচেন, বাড়ীর মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো তাদের নাইবার সুবিধার জন্যে। সবসুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা হোলে বাড়ীটা পাওয়া যায়–জমিসুদ্ধ–কিনবো? প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই–

–অত কম হবে?

–পাড়া গাঁ। কে সেখানে খদ্দের হচ্চে? যদ্দুর শুনলাম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনার লোক নেই।

–টাকা দেবে কোথা থেকে?

–প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমরা গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কিছু ধার করি। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখে নি। বাপের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে

দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্য্যন্ত উঠে এসে কলকাতায় বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয়।

ভগবান কি এত দয়া করবেন? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে?

শ্যামলী বললে–কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে?

–কেন, সেখানে!

–আপিসে?

–চাকুরি ছেড়ে দেবো। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভাল লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

–ছেলে দুটোর লেখাপড়া?

–রাণাঘাট বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখচে, এ শিখে তো কেরানী হবে? তার চেয়ে ভাল কাজ ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে? গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভাল কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়তে শেখাবো। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

BANGLADARSHAN.COM

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হোল। শ্যামলীর চোখে রঙিন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে– দূরের-পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা–বিছানায় আধ-জাগরিত আধ ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে! কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা!

দিনপনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বললেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বললেন–উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে কয়ে উনিই বাড়ী দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়া দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু বললেন, বাড়ী রেজেস্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়ীতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে ঘর বন্ধ চাবিবন্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদলে ওরা বেলা দশটার সময় বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ী স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ী। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বললে—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়ীটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হোল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি? সর্ব্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা!

BANGLADARSHAN.COM

ক্রমে আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময়ে গাড়োয়ান বললে—এই যে বাবু, বাড়ীর সামনে এসে গিয়েছে গাড়ী। নামুন মা-ঠাকরুণ এবার।

দুরু দুরু বক্ষে শ্যামলী নামলো সকলের আগে। যদুবাবু বললেন—না দেখে বাড়ী কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ী কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়ীতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্চে না, কি জানি কি রকম হবে! নামো আগে।

—হ্যাঁগো বাড়ী কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা! গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথা?

গাড়োয়ান শুনতে পেরে বললে—মা ঠাকরুণ, বাড়ীতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ী দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ী খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্যামলীর সামনেই যে বাড়ীটা পড়লো, সেটা দেখে সে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ী তাদের! এমন বাড়ী এই অজ পাড়াগাঁয়ে।

কলকাতায় এমনি হলদে রঙ করা সবুজ রঙের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ী দেখেচে—দোতলাও নয়, বাড়ীটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়ীটা সত্যিই তাদের নিজস্ব।

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে—ওগো দ্যাখো, এসে দ্যাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হোল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে। ততক্ষণে যদুবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ীর কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বললেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ীর কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ী বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যি করলেন। তেতলা বাড়ী, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, ফলপাকড়ের গাছ। দ্যাখবেন বাড়ীর মত বাড়ী!

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারে নি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়ীটা দেখে মনে হোল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়ীটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হলদে রঙের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ী ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি—কি যেন নাম ওর—মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

BANGLADARSHAN.COM

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলো। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে পড়িচি এই অবেলায়। বেন্‌বেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুণরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মত বাড়ী ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কম্মো? আসুন মা ঠাকরুণ, আসুন বাবা—

শ্যামলী বললে—তোমার নাম মুক্তোর মা?

—বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা। নামটাই আছে বজায়, যার জন্যি সে আর নেই। তা হলি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্যামলীর ওসব কথা ভাল লাগছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে বাড়ীটার ওপর নিচে সব দেখে আসে। কিন্তু কী মনে করবে এরা। কী মনে করবে মুক্তোর মা।

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে। বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ালা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অন্য একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর। শ্যামলীর বড় ছেলে কানাই বললে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসার ঘরের চেয়েও অনেক বড়। দ্যাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে?

বড় মেয়ে ডলি বললে—কতগুলো জানলা দ্যাখো মা রান্নাঘরে।

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দুড় করে সবাই উঠলো। শ্যামলী বললে–ওগো, দ্যাখো কি সুন্দর মেজে। কাঁচে শার্সি বসানো জানলা!

কানাই ও ছোট ছেলে বলাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে–কি সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে–ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট্ট নদীটা, ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন ঝোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে–ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা?

যদুবাবু বললেন–ও ঝিঙের ফুল। বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝিঙের ফুল ফোটে কিনা! সত্যি, ভারি সুন্দর সিনারিই বটে, ওগো, দ্যাখো ইদিকে এসে! কি ফাঁকা!

শ্যামলী বললে–তেতলার ঘরটা দেখে আসি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু খুব বড় বড় তিনটি জানালা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশ করা মেজে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মুক্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্যামলীর চোখে জল এলো। এ যে রূপকথার রাজবাড়ী তার কাছে, সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বৌ, কলকাতার বাসার অন্ধকূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়ীঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে এসে বললে–বাঁধাঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে চটা উঠে গিয়েচে চাতালের। তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো–দেখা যাচ্চে–এই উঠোনটাই পার হয়েই–

BANGLADARSHAN.COM

যদুবাবু বললেন–নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক। জিনিসের মত জিনিস। বাড়ীর মত বাড়ী। ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করবো এত লোকের চলচে আর আমার চলবে না? খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও জিনিসপত্তর সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা?

মুক্তোর মা বললে–তিনটে আমগাছ আছে, সাতটা কাঁঠাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলিতি কুলগাছ, দু ঝাড় কলাগাছ চারটে নারকোল গাছ। বাবুরা নিজির হাতে সব লাগিয়েছিল, থাকবে বলে। শম করে কলকেতা থেকে চারা এনে এই ওবছর ওই দ্যাখো একটা চাঁপা ফুলগাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। শ্যামলীর দুঃখ হোল, এখন আর কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি পথঘাট চিনে নেওয়া যেতো, ভাল করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালালে। ডাকলে–মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা–

মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে দোতলায় তুলছিল। বললে–কি মা?

–জল আছে বাড়ীতে?

–জল তুলে রেখেচি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তর নেই মা তাই তুলতে পারি নি–

–বাঁধানো পাতকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে। চলুন, আমি দেখিয়ে দি। বাবুদের বাড়ী কোন ত্রুটি ছিল না মা, আগাগোড়া সান বাঁধানো। চৌবাচ্চা আছে বাঁধানো।

–তাতে জল তুলে রাখো নি?

–নাইবেন যদি তবে পাতকুয়োর জলে কেন মা? দিব্যি বাঁধানো নদীর ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠেগুলো ডুবে গিয়েচে। চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন গাছ তার ছায়া পড়েছে বাঁধাঘাটের পৈঠেগুলোতে। কি একটা পুষ্পের সুবাস বাতাসে ভুরভুর করচে। এই গাছ থেকেই আসচে।

–কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা?

–কি একটা লতা এই গাছে উঠেচে মা, কাল সকালে দেখবেন, সাদা সাদা ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরি।

BANGLADARSHAN.COM

শ্যামলী জলে নামলো। আজ সে রূপকথার রাজকন্যে। স্নিগ্ধ জল, ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের সুগন্ধ। তারাভরা আকাশ। এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-সুবাস–সব তাদের, নিজস্ব। তারা পয়সা কিনেচে। কলকাতায় সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাস গিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্যেই সত্যি কষ্ট হোল। বেচারী মতির মা। বেচারী শশীবাবুর বৌ। ওদের একবার এখানে আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না সৌভাগ্য।

ডলি চেঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে–ওমা, শিগগির গা ধুয়ে এসো–বাবা চা চাইচে...এসো চট করে–

শ্যামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সাবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাড়াতাড়িতে।

–মুক্তোর মা, ছুটে যাও বড়দিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সাবানের বাক্সটা আছে, দিতে।

॥সমাপ্ত॥